জানালা

রামচন্দ্র প্রামাণিক

বললাম, ঠান্ডা আসবে ঠাম। এখন বন্ধ থাক।

ঠাম বলল, না রে, বেলা উঠে গেছে। খুলে দে।

জানলা খুলে দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝলমল করা সকাল। বিজয়াদশমীর পরদিন। বাতাসে ঠান্ডার আমেজ। চাদরে কান ঢেকে ঠাম চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

শহরতলির এদিকটা এখনও ফাঁকা ফাঁকা। জানলার বাইরে নারকেল, পেয়ারা, সবেদা, কলাগাছ। তারপর সাহা পুকুর। মায়াবী আলো মাখানো শরৎ শেষের সুপ্রভাত। শ্যামল এবং শান্ত! পাতা ফুঁড়ে উদীয়মান সূর্যের রশ্মি আসছে সুচালো বর্শার মতো।

ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল দোতলায়। মোবাইল হয়ে যাওয়ার পরে এ ফোনটা আর বেশি বাজে না তাই রক্ষে। আগে কি কাণ্ডই যে হত! ফোন দোতলায় রাখা সবার সুবিধের জন্য। কিন্তু ফোন আসা মানেই হাঁকডাক। মেজদা কোথায়? বড়দার ফোন। রমেনকে ডাকো। ছোটোকাকু, তোমায় চাইছে। কাকিমা, তোমার সেই দিদি মনে হল। তিনটি তলায় শুরু হত কথা চালাচালি।

সন্তুদাদা বলল, মিঠু *দেশ* পুজো সংখ্যাটা নিয়েছিস? নীচের ঘরেই তো ছিল। দেখ তো ছোটোকাকিমার কাছে কি না। একটা কবিতা টুকে নিয়েই ফেরত দেব, বল।

পুজো সংখ্যা ছোটোকাকিমা কেনে।

মঞ্জুদিদি ওদিকে হেসে কুটি কুটি। দোতলার সিঁড়ির মুখ থেকে বলল, জানো মিঠু, আমি হ্যালো বলতেই বলল, কে, মধু? গলা একেবারে গদগদ। আমি বললাম, মধু না, আমি গুড়। তা কটাস করে লাইন কেটে দিল। বললেই হত, হ্যাঁ, মধু বলছি। দেখা যেত রগড়।

মঞ্জুদি হাসতে হাসতে তেতলায় উঠে গেল। ছোটোকাকিমা ডাকছে।

আমার খুব ইচ্ছে করে তেতলায় গিয়ে পড়তে। তা ছোটোকাকু রাগ করে। ছোটোকাকিমা অবিশ্যি বলে, তোর কাকু যখন থাকবে না তখন আসিস। আচ্ছা কেন রাগ করে ছোটোকাকু? মদ খায় বলে? আহা! কারও বুঝি বাকি আছে জানতে!

বাড়িতে তেতলাটা একদম অন্যরকম। মার্বেল বসানো মেঝে, টয়লেট রান্নাঘরে গ্লেজড্ টাইলস্। একেবারে ঝকঝক করছে। দাদুর তৈরি বাড়ি ছিল দোতলা, পাঁচটা ঘর নীচে ওপরে। এদুটো আমাদের আর জেঠুর ভাগে, সঙ্গে ঠাম। তেতলাটা ছোটোকাকু নিজের মতো করে নিয়েছে। তাই তিনতলায় যাওয়া বারণ। ছাদেও।

চেঁচিয়ে বললাম, যাই জেঠু। জেঠু ডাকছে, নীচে থেকে। নীচের একটা ঘরে থাকে ঠাম, অন্যটায় জেঠু আর জেঠিমা।

জেঠু বলল, মিঠু মা, একটা বইয়ের নাম লিখে নে তো। *হিমারণ্য*, রামানন্দ ভারতীর লেখা। মানস সরোবর কৈলাস ভ্রমণের কাহিনি। এটা নিয়ে আসিস তো।

বই আনতে হবে পাড়ার লাইব্রেরি থেকে। খুব ভালো লাইব্রেরি। কিন্তু নতুন স্টক আসে না বিশেষ। এটা পুরোনো বই। হয়তো পাওয়া যাবে। এমনিতেও আমায় যেতে হত। বাবা একটা বই আনতে বলেছে। *অটোবায়োগ্রাফি অভ এ যোগী*। স্বামী যোগানন্দের লেখা। তার বাংলা অনুবাদ।

বাড়িতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছোটোকাকুর ব্যাঙ্ক আজ খুলছে। বাবার প্রাইভেট অফিস, সেটাও আজ খুলবে। শুধু জেঠুর ছুটি। কর্পোরেশন স্কুল খুলবে সেই ভাইফোঁটার পরে। কিন্তু বড়দা? তিনি সবসময় ব্যস্ত। জেঠিমাকে বলল, এগারোটায় বেরুব। তার মানে এগারোটার মধ্যে তেনার ভাত চাই।

বড়দাকে দেখতে রাজপুত্রের মতো। বড়দিও তেমনি। কিন্তু এই নিয়ে জেঠু অনেক বাঁকা কথা বলে। বড়দির বিয়ে হয়েছে ওপাড়ার দত্ত বাড়িতে। জেঠু একদিন বলছিল, বুঝলি সজল, মায়ের চেহারা পেয়েছে বলে মেয়েটা মুফতে পার হয়ে গেল। তবে শুনতেই বনেদি ঘর। ছেলেটা অকাল কুষ্মাণ্ড। মেয়ে আমার শুধু মাতৃকুলের রূপ পায়নি, তাদের মাথাও পেয়েছে। সম্প্রদানের সময় ভাবছিলাম, কি জিনিস নিয়ে যাচ্ছ বাবাজীবন, এখন বুঝছ না। ছেলেমেয়েরা যখন ফি বছর ফেল মারবে তখন পুরোনো দিনের ফুচকা ঝালমুড়ির কথা মনে করে চোখের জল ফেলবে।

সজল ঘোষ পাড়াতেই থাকে। জেঠুর প্রাণের বন্ধু।

প্রথমে বাবা বেরিয়ে গেল। তারপর ছোটোকাকু। তারপর বড়দা। বড়দা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এমন তাড়া লাগায় যেন রাজকার্য অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সন্তুদার, আমার, বিল্টুর আর পল্টুর ছুটি। ক্লাস খুলবে ভাইফোঁটার পরে।

তারপর এল মিলন মামা। জানলার বাইরে তাকিয়েই জেঠু গম্ভীর হয়ে গেল। মিলনমামাকে সিঁড়িতে দেখে মার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ওপর থেকে উচ্চৈঃস্বরে কথা আর হাসি।

মিলনমামা ছোটোকাকিমার কেমন সম্পর্কের ভাই। হোম ডেলিভারির কাজ করে। বাড়ি বাড়ি দরকারি জিনিসপত্র পৌঁছে দেয়। মাকে জেঠিমাকে বলে, কি গো দিদিরা। তোমাদের এই বেকার ভাইটা কি না খেয়ে মরবে? কিছু অর্ডার ছাড়ো। তারপর উঠে যায় ওপরে। জানে একতলা দু-তলা থেকে অর্ডার আসবে না। তারা নিজেরা দোকানে গিয়ে দর কষাকষি করে দু-পয়সা সাশ্রয় করবে।

দিদিভাই, দিদিভাই, ঠাম ডাকছে। ছুটে নেমে এলাম। একতলায়। জানলাটা খুলে দে দিদি, ঠাম বলল।

বোধহয় ঠামের ঝিমুনি এসেছিল। তখন জেঠিমা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরটা অন্ধকার।

জানলা খুলতেই ঘরটা আলোয় ভরে গেল। ওপারের ঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। একজন বাসন মাজছে সেই কখন থেকে। পাতিহাঁসের একটা বড়ো দল ভেসে বেড়াচ্ছে মাঝপুকুরে। একটা পানকৌড়ি অনেকক্ষণ পরে পরে ভেসে উঠছে। দুটো, বক ধ্যানমগ্নের মতো বসে আছে ওপারের পাড়ে। ঠাম হাঁ করে এসব দেখে।

ওপর থেকে মিলন মামার হাসি শোনা যায়। বিল্টু-পল্টুও হাসছে? মঞ্জুদিও হাসছে। কেন যে মা শুধু শুধু রাগ করে।

বাড়ি আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে পড়ে। নীচের রান্নাঘরের কাজ সেরে জেঠিমা শুতে যায়। দোতলার রান্নাঘর বন্ধ করে মা শুতে যায়। সন্তুদা বেরিয়ে যায় — কোথায় ওর কবি বন্ধুদের আড্ডা আছে। ওপরে ছোটোকাকিমা বিল্টু-পল্টুকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। সাড়ে তিনটে বাজতে না বাজতেই আমি ফোনের কাছে দাঁড়াই।

ফোন বাজতে না বাজতেই রিসিভার তুলে নিই।

হ্যাঁ, আমি বলছি। ও তো মঞ্জুদি। ছোটোকাকিমার কাছে থাকে। তুমি ওই সময়ে করলে কেন? না, কক্ষনো করবে না অমন উলটো-পালটা সময়ে।

ও বলল, মধু, লক্ষ্মীটি, শোনো না। কী ইচ্ছে করল হঠাৎ কথা বলতে। শোনো না, কাল প্যান্ডেলে কোনো টুকটুকে ফ্রক পরা মেয়ে দেখলেই মনে হচ্ছিল, তুমি।

আমি হেসে বললাম, খুব শখ। এই রাখছি। নীচে বেল বাজছে। কে এল দেখি। আচ্ছা, কাল।

নীচে ছুটে গিয়ে দেখি, ক্যুরিয়ার। ছোটোকাকুর। শুধু শুধু ফোনটা ছেড়ে দিলাম।

ফোন করে অরিন্দম। আশুতোষ কলেজে পড়ে। ফার্স্ট ইয়ার, ফিজিক্সে অনার্স। ত্রিপুরায় বাড়ি। টালিগঞ্জে থাকে, মামারবাড়ি। একদিন রং কানেকশনে কথা হয়েছিল, তারপর থেকে যোগাযোগ রাখে। মনে হয় খুব ভালো ছেলে। কী ইনোসেন্ট!

অবিশ্যি যদি সত্যি বলে থাকে। আমি তো সত্যি বলিনি। নাম বলেছি মধু — তাড়াতাড়িতে ওটাই মুখে এসেছিল। পড়ি সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যাপীঠে, বলেছি সুবর্ণলতা বালিকা বিদ্যাপীঠ। বাবা প্রাইভেটে চাকরি করে, বলেছি ব্যাঙ্কে। অবিশ্যি ক্লাসটা ঠিক বলেছি, নাইন।

আজ কী বিশ্রী কাণ্ডটাই যে ঘটল! ছাদে জেঠিমা জামাকাপড় রোদে দিয়েছিল। ছোটোকাকিমা পই পই করে বলে, সময়মতো তুলে নিয়ো ও আসার আগেই। তা জেঠিমা ভুলে গেছে, যেমন যায়। রাতে জামাকাপড় নিয়ে নামার সময় পড়বি-তো-পড় ছোটোকাকুর সামনে। কী যাচ্ছেতাই যে বলল! তোমাদের মতো বাপের ইমারত ভোগ করছিনে। এটা আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বানানো। এগ্রিমেন্টে পরিষ্কার লেখা আছে দোতলার ওপরে তোমাদের কোনো স্বত্ব নেই। এই সাদা কথাটা কি পুলিশ ডেকে বোঝাতে হবে?

জেঠিমা কেঁদে ফেলল। ভাগ্যিস বড়দা বাড়ি ছিল না। সেই রগচটাটা থাকলে আর এক কেলেঙ্কারি হত।

আমরা সবাই থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ছোটোকাকুর মুখ থেকে ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরুচ্ছে। বিল্টু-পল্টু ভয়ে কাঁপছে। ছোটোকাকিমা জেঠিমাকে হাত ধরে নীচে নিয়ে যাচ্ছিল বলে ছোটোকাকু কি একটা খারাপ কথা বলল। বস্তিবাড়িরও অধম, মা বলল।

বাড়ির আবহাওয়া থমথম করছে। এখন বাবার জপের সময়। বাবা আজ অনেকটা সময় নিয়ে জপ করবে, জানি। দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে দেখছি, কিছু সমস্যা অশান্তি হলেই বাবা জপের আসন থেকে আর উঠতে চায় না।

ঠাম নীচে চিঁ চিঁ করছে একটানা, কী হল রে? কী হল রে?

আমি ছুটে নামলাম। বললাম, কিচ্ছু না, তুমি ঘুমোও। ঠাম বলল, আমার গভেভর দোষ। নারায়ণ, নারায়ণ।

সব বোঝে ঠাম। যা গুণধর ছেলে।

জেঠু সন্তুদাকে বলছিল, জানিস সন্তু, হিমালয় না দেখলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না। হিমালয় হল ভারতের আত্মা। আর সত্যিকার দেবভূমি। তারপর বর্ণনা করতে শুরু করল। হিমালয়ের কোন অঞ্চলের কী বৈশিষ্ট্য। কী পার্থক্য কিন্নরের সঙ্গে গাড়োয়ালের, কাশ্মীরের সঙ্গে লাদাখের।

সন্তুদার এসব শুনতে অবিশ্যি ভালোই লাগে। ও যে কবিতা লেখে। এখানে ওখানে চটি চটি পত্রিকায় কিছু ছাপাও হয়েছে। আমাকে বলে, তুই ওসব বুঝবি না। কান এবং মনটাকে তৈরি করো যদি আধুনিক কবিতা বুঝতে চাও।

আজ অরিন্দম ফোন করেনি। ও কিন্তু সব সত্যিই বলে। গলা শুনে মনে হয়। আমার মন ঠিক বুঝতে পারে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একটা ঠিকে ঝি আসে শুধু একতলা দু-তলা ঝাড়া মোছার জন্য। এছাড়া আর কোনো কাজের লোক নেই, না আমাদের না জেঠিমার। ফোন না এলে আর কী করা যাবে! মায়ের পাশে খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে পড়লাম। ঘুম এল না। নোনাধরা দেয়াল আর কালিপড়া সিলিংয়ে কী যে মলিন লাগে বাড়িটা!

মঞ্জুদি বিলুকে নিয়ে পার্কে যাচ্ছে। আমিও গেলাম ওদের সঙ্গে। ছোটোকাকিমা টাকা দিয়েছিল। আমরা চিনেবাদাম খেলাম। ওখানে হারু বলে একটা লোক তুতুল বলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে। মঞ্জুদি খুব চেনে। সে অনেক গল্প করল।

দাদা ফিরল বেশ দেরি করে। মা খাবার নিয়ে বসেছিল। বলল, এত রাত করলি যে!

দাদা বলল, একটা কবিসম্মেলন ছিল। আমাদের পুজো সংখ্যাটা আজ বেরুল কি না। আমি তো টাকা বা অ্যাড্ দিতে পারিনে। তাই খাটাখাটনিটা আমিই করি। জানো মা, কত বড়ো বড়ো কবি-সাহিত্যিকরা সব এসেছিলেন। তাঁদের চোখে দেখলেও পুণ্য। আর কী কবিতাপাঠ! কী বক্তৃতা!

মা বলল, কী জানি বাপু! পড়াশুনার নামে লবডঙ্কা। সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়াও। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কী আনন্দ যে পাও!

ছোটোকাকিমা মা-র সঙ্গে কথা বলছিল, চাপা গলায়। মা নিচু স্বরে কী যেন একটা সান্ত্বনার কথা বলল। দুজনেরই মুখ যেন কালি লেপা। এমন সময় বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল আর ছোটোকাকিমার মুখে যেন আলো জ্বলে উঠল। বলল, ওই মিলন এল। দেখি জিনিসগুলো ঠিকমতো এনেছে, না ভুলে মেরে দিয়েছে।

মা ফিসফিস করে জেঠিমার সঙ্গে কথা বলছে। কাল রাতে ছোটোকাকু নাকি তার পরেও অনেক হুজ্জোত করেছে। ছোটোকাকিমাকে মেরেছে। বমি করে ভাসিয়েছে। মা বলছিল, তাইতো ভয়ে ভয়ে থাকি দিদি। মিলনের রোজ রোজ কী এমন কাজ এ বাড়িতে! আর কীসের এত গল্প এতক্ষণ ধরে? কী সর্বনাশ যে হবে! এখন না হয় পুজোর ছুটি, বাচ্চারা বাড়ি রয়েছে। ছুটি শেষ হওয়ার কথা মনে হলেই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

জেঠিমা সরল মানুষ। বলল, না, না। মঞ্জু রয়েছে না!

আমার কী খারাপ যে লাগে!

পুরো বাড়িটা নোংরা। রং হয়নি কতদিন! দেয়াল নোনা ধরা, চটা ওঠা। সিলিং ভর্তি ঝুল

আর কালি। ফ্যানগুলো ঘোরে ক্যাচোর-ম্যাচোর শব্দ করে। বাইরে এত আবর্জনা জমে আছে চারদিকে। বাবা-জেঠুর তো পয়সা নেই। ছোটোকাকুর তো আছে। কিন্তু তার নিজের আবর্জনা কে সরায় তার ঠিক নেই।

অবশ্য জেঠুর এসব বিশেষ নজরে পড়ে না বোধহয়। জানলার পাশে বসে বই পড়ছে। *পিগমিদের দেশ* — মলাটের ওপর লেখা। জেঠু ভ্রমণ কাহিনির পোকা। কত জানে জেঠু, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হবে সবে ঘুরে দেখে এসেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অথচ সারাজীবনে মাত্র একবারই জেঠু বেড়াতে গিয়েছিল। পুরীতে।

আমি নেমে ঠামের ঘরে গেলাম। ঠাম শুয়ে আছে। শুয়েই তো থাকে সবসময়। এখন অবিশ্যি ঘুমোচ্ছে। জানলাটা আস্তে খুললাম, শব্দ না করে। কলাগাছে মোচা পড়েছে। একটা প্রজাপতি মোচার ফুলের ওপর উড়ছে আর বসছে। দুটো কাঠবেড়ালি পিড়িং পিড়িং শব্দ করে নারকেল গাছটার গুঁড়ি বেয়ে উঠছে আর নামছে। টিয়ার ঝাঁক রয়েছে কোথাও। তাদের কলরবে পুকুরধার মুখর। হঠাৎ দেখি একটা টিয়া একা একা উলটে ঝুলে আছে পেয়ারা গাছটার ডাল আঁকড়ে। বাঁকানো ঠোঁটে পেয়ারাটার গা থেকে শাঁস কুরে নিচ্ছে এবং যেন অবহেলায় চোখ রেখেছে জানালার এ পাশে বসে থাকা আমার দিকে।

দিদিভাই, ঠাম ডাকল — দেখত গুনে আজ কটা কাঠবেড়ালি।

মা ডাকল। চেয়ে দেখি, ঠাম আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে জানলা বন্ধ করে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরুলাম, যাতে ঠামের ঘুম না ভেঙে যায়।

মা বলল, আমসত্ত্বগুলো ছাদে নিয়ে যা। রোদ খাইয়ে নিয়ে আয়। খবরদার ফেলে আসবিনে। ভুলে যাবি তাহলে। যা কেলেঙ্কারি হল কাল রাতে।

ছাদে উঠতে গিয়ে শুনলাম বিল্টু-পল্টু হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে মিলন মামার গল্প শুনে। ছোটোকাকিমা বলছে, তুমি বাপু পারোও বটে।

ছাদে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। চিলেকোঠার ছায়ায়। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উড়ে চলেছে কোথায়, কোন দূর দেশে। এরা কত দূর যাবে, কত দেশ দেখবে, যেসব দেশ জেঠু দেখেনি, শুধু বইয়ে পড়েছে। কটা চিল উড়ে উড়ে ঘুরছে নীল আকাশের গায়ে। ওদের চোখে কেমন দেখতে লাগে নীচের বাড়ি-ঘর-গাছপালা-পুকুর-মানুষজন? যারা প্লেনে উঠেছে, দেখেছে আকাশ থেকে, তারা নিশ্চয় জানে। অরিন্দম প্লেনে উঠেছে। ত্রিপুরা থেকে প্লেনে আসতে হয়, বলেছিল। অরিন্দমের কথা মনে হতেই আমার ভেতরটা মুচড়ে হু হু করতে লাগল।

নীচে নামছি। দেখি মিলনমামাও উঠে দাঁড়িয়েছে যাবে বলে। ছোটোকাকিমা ঝলমলে মুখে বলছে, বাব্বা! তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে ধড়ে যেন প্রাণ এল। কাল থেকে দম বন্ধ হয়ে আছে।

নীচে ছুটে গেলাম। ঠাম ডাকছে। জানলাটা খুলে দে দিদিভাই। বাইরের আলো-হাওয়া আসুক। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আজ অরিন্দমের ফোন এল ঠিকসময়ে। বাজতে না বাজতেই রিসিভার তুলে নিলাম। চাপা গলায় বললাম, কাল করনি কেন? মিথ্যুক কোথাকার! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।